তৃতীয় অধ্যায় । ব্রতকথা-সূচনা, কড়াকড়ি ....

ব্রতকথাগুলি বাংলাদেশের সর্বত্রই আছে । গ্রামবাংলার নারী সমাজের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খার কথা আমরা বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্যে পাই । এগুলি বাংলার লোক-কথারই একটি রূপান্তর বলে লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন থাকেন ।

ব্রতকথাগুলি বাংলার লৌকিক দেবতাদের আশ্রয় করে রচিত হয়েছে । ব্রতকথায় আমরা যে সমস্ত পৌরাণিক দেবদেবীর নাম পাই আসলে তারা কেউই পৌরাণিক বা বেদোক্ত দেবদেবী নয় । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লৌকিক দেবতার বদলে হিন্দু পুরানোক্ত দেবতা অবলম্বন করে ব্রতকথা রচিত হয়েছে সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে ব্রতকথায় হিন্দু পুরাণোক্ত দেবতার উল্লেখ থাকলেও তাঁরা শুধু নামেই আছেন । সেইসব দেবদেবীর প্রকৃত আচরণ পুরাণ বর্ণিত দেবদেবীর চেয়ে প্রকৃত নর-নারীর মত ব্যবহারেই তাদের লোকদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । সেজন্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে যথার্থ বলে মনে হয় — "বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবন এবং চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আর কিছুর মধ্যেই প্রকাশ পায় নাই । বিশেষত ইহারা নানাবিষয়ে রক্ষণশীল বলিয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও আচার জীবনের এক অতি প্রাচীন রূপ ইহাদের মধ্য দিয়াই সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে । দেবতার কথা ইহাদের মধ্যে অবান্তর মাত্র । সমাজ এবং মানুষই ইহাদের মধ্যে মুখ্য ।

দোষ ও গুণের মধ্যেই যেমন মানুষের চরিত্রের বিকাশ সাধন ঘটে তেমনি দেবচরিত্র কল্পনাতেও অশুভ-অনিষ্টকারিণী শক্তির (MALIGNANT POWER) সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভকরী (BENEVOLENT) শক্তির পরিকল্পনাকেও স্থান দেয়া হয়েছিল । বলা বাহুল্য আর্য ও অনার্যের সমাজের সংমিশ্রণের ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে নূতনভাবে সমাজ সংহতি সাধিত হয়েছিল, শুধু মাত্র তাদের মধ্যে দেবতা-চরিত্র সম্পর্কে বিপরীত ধর্মীগুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছে । এই মিশ্র পরিকল্পনার ফলে একই দেবতারা দেবীর শক্তির অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতাও যেমন আছে আবার ইষ্ট বা উপকার সাধনের ক্ষমতাও তাঁর আছে । কাজেই এই মিশ্রগুণসম্পন্ন দেবতা বা

দেবী ভক্তের উপর তুষ্ট হলে যা ধন চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায় আবার এই দেবতা বা দেবী ভক্তের উপর অসন্তুষ্ট হলে ভক্তের প্রচুর অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতাও তাঁর হাতে থাকে । এই ইষ্ট বা অনিষ্টকারী ক্ষমতার প্রয়োগ মানবজীবনের ইহকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য । কাজেই তা মানবজীবনের বাস্তব সুখদুঃখের সঙ্গেই জড়িত থাকার কথা । সেজন্য দেখা যায় ব্রতকথার দেবতারা মনুষ্যরূপ ধারণ করে ভক্তের কাছে আসেন । ভক্তের সুখদুঃখের সমব্যথী হন কখনও তাদের দেখা যায় মানুষের (ভক্তের) প্রতি তার প্রতিহিংসাপরায়ণমূর্তি - কখনো বা মানুষের দুঃখ যাতনা দেখে সমবেদনার অংশভাগীও হচ্ছেন । সুতরাং এই দেবতা লৌকিক দেবতা ছাড়া আর কীই বা হতে পারেন । আসলে এঁরা দেবতার বেনামীতে মানুষেরই নামান্তর মাত্র । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সেজন্য যথার্থই বলেছেন যে, উপকথার রাজ্যে পশু ও মানুষ যেমন একাকার হয়ে বাস করে তেমনি ব্রতকথার রাজ্যেও মানুষ এবং দেবতা একাকার হয়ে আছে ।

বাংলার ব্রতকথার মত প্রকৃশভুক্ত অঞ্চলেও ব্রতকথা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মেয়েরা পালন করেন । এই ব্রতকথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল কড়াকড়ি পুজার ব্রত, সুবচনী পুজার ব্রত, বুড়াবুড়ী পুজার ব্রত, কাতিপুজার ব্রত । এই ব্রতগুলির প্রচলন প্রধানতঃ কোচবিহার ও গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায় । বলাই বাহুল্য প্রগুক্ত ব্রতগুলি পালনের ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজের মেয়েরাই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন । তবে রাজবংশী ছাড়াও কায়স্থ, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, ভুঁইমালী প্রভৃতি সমাজের মহিলারাও এই সমস্ত ব্রত পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন । উল্লিখিত ব্রতগুলির মধ্যে কাতিপুজার ব্রতের প্রচলন আমরা গোয়ালপাড়া জেলার কৈবর্ত সমাজের মেয়েদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখতে পাই । এই কাতিপুজার ব্রতকথাটি একাদশ অধ্যায়ের 'লৌকিক দেবতা ও তাহাদের বিশিষ্ট পুজাবিধি' অংশের কাতিপুজা শীর্ষক পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করেছি । সেজন্য এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করা গেল না । উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর ~~জেলা~~ জেলায় রাজবংশীদের সমগোত্রীয় 'দেশীয়া' সমাজের মধ্যে 'মাষী'-র নামে এক ব্রতের প্রচলন দেখা যায় । এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান দেশীয়ার সমগোত্রীয় পলিয়া কিংবা অন্য কোন সমাজের মধ্যে এই ব্রত পালনের বিধান নেই ।

এবারে ব্রতগুলির অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সুবচনীর ব্রত প্রসঙ্গে আসা যাক । সুবচনী পুজার ব্রতানুষ্ঠান বৈশাখ মাসেই করা হয়ে থাকে । তবে বিশেষ মানত থাকলে অন্য মাসেও করা যেতে পারে । এই সুবচনী সম্ভবতঃ সুভচণ্ডী শব্দজাত ।

এই পূজা বাড়ীর উঠানে করা হয়। প্রথমে প্রয়োজন কলার নেউড়পাত (লেজপাত) এই নেউড়পাতের উপর পূজোর বিভিন্ন উপকরণ সাজাতে হয়। ষোলটিয়া (ষোলটি কলা আছে এমন) কলার তিনটি ঝুঁকি দিয়ে 'থাতি' সাজাতে হয়। কলা মাল ভোগ বা মনুয়া উভয়ই হতে পারে। কাচাগুয়া ও নূতন পানের আটি এই পূজোর অপরিহার্য উপকরণ। পূর্বের উল্লিখিত কলার থাতিও নেউড়পাতায় সিঁদুর মাখানো হয়। নৈবেদ্য আবশ্যক হয় 'আবোং' (কাটা বা ভাঙ্গা নয় এমন) গুয়াপান, চুন, তামাক পাতা ও আতপ চালের। কাটারির মুখে কাটাগুয়ার অর্ধেক রেখে দিতে হয়। পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রয়োজন হয় ৩ কিংবা ৫ জনের মত কুমারী মেয়েকে। এই কুমারীরা সধবাদের কপালে সিঁদুরের ফোটা পড়িয়ে দেয়। কুমারীগণ পূজো শেষে পান-গুয়া দক্ষিণ ভারীঘরের উপর ছুঁড়ে দেয়। এই পূজো শুভ কাজ ছাড়াও গৃহস্থের মঙ্গলকামনায় তার আপদ উদ্ধারের জন্য করা হয়। রাজবংশী সমাজে বিয়ের পর দিন বরের গৃহে এই পূজো পালন করার বিধি আছে।

ব্রতকথাটি আলোচনা অংশের শেষে 'সুবচনীব্রত' অংশে দেয়া হয়েছে। এবারে এই পূজোয় 'কথাতী' রা যে গান করে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা হোল —

নোকটারে নটুয়া - মেঘের থটুয়া
মেঘের তেলে বড় বাতি জ্বলে ॥
সিম সিমানী ঝাড়ি পরে ঘুগুই করে রাও
ভার (দেড়) বুড়ি ডিমা পারে দক্ষিণবাড়ীর মাও ॥
দেওয়ায় করে মেঘ মেঘালি তোলায় পুবান বাও
ভর আঙিনাত পূজা করে সুবচনীর মাও ॥
সুবচনীর গুয়া খায়া পড়েয়া দিলেক পিক
দাখিনাবাড়ীর মাও এলা হাবেয়া কেলাইল দিক।
নয়া কৈনা নয়া বর উজোগারে সুবচনীর যাতি ঘর কর ॥
অকুমারী কৈনার হাতে পাটলেয়া জেলান বাতি।
তবে সেনে মিলিবে তোমার মনের মত পতি ॥
খারা গুয়া খারা পান সুবচনীর পূজা।
পরথোমোতে করিল পূজা উজানীর সুবচন্দ্র রাজা ॥
তার কইন্যা কইন্যামতী মাগিয়া নিলেক বর।
তোমার বাড়ীত তোমরা যান আমরাও যাই ঘর ॥ ২

কড়া-কড়ি পূজার ব্রত অনুষ্ঠান।

এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য হোল - ধন জন বৃদ্ধি, বলমর্য্যাদাবৃদ্ধি। এই পূজাতেও কোন মূর্ত্তি নেই। জোর ঘট স্থাপন করে এই পূজা করা হয়। গোয়ালপাড়া জেলার বিলাসীপাড়া অঞ্চলে কার্ত্তিক মাসের সপ্তমীতিথির দিনে এই পূজার ব্রতানুষ্ঠান হয়। আবার গৌরীপুর অঞ্চলে পৌষসপ্তমীতিথির দিনে করাই বিধেয়। মাঘ মাসেও চলে তবে ফাল্গুন মাসের ১৩ দিন গেলে কিছুতেই আর এই পূজা করা চলে না। গৌরীপুর রূপসী অঞ্চলে এই পূজা কাচা গোবরের উপরে দুটি কড়ি স্থাপন করে করা হয়। কড়া-কড়ির থান' পাতা হয় বাস্তুভিটার কাছাকাছি জায়গায়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নেই।

এই পূজাতেও ধূপ, সরষের তেলের প্রদীপ, মুরি, খই, ফলমূলের মধ্যে কলা, কুমার লাগে। বিশেষভাবে প্রয়োজন কছরী ফুল, ডেট ফুল, ঢেকিয়া শাক, কলমী শাক, যমুনার জল। এই সমস্ত উপাচারে পূজার বেদী নির্মাণ করার পর উপস্থিত থাকা সবাই (স্ত্রী-পুরুষ) কড়া-কড়ির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবে। তারপর একজন স্ত্রীলোক কড়া-কড়ির ব্রতকথা বলবে অন্যেরা শুনবে। এই ব্রত অনুষ্ঠানটিও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশের শেষে দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বুড়া-বুড়ীর পূজার প্রচলন ফকিরা গ্রামের কাছে 'সাকাতি' পাহাড়ের পাদদেশে, লক্ষ্মীপুরের কাছে 'ঢেপ-ঢেপী' গ্রামে দেখা যায়। এই পূজার ব্রতকথাতে পাওয়া যায় এক সদাগরের পুত্রের একটি ধনেশ পাখী ছিল। অজ্ঞাত কারণে পাখীটি মারা যাওয়ায় গভীর অরণ্যে বসে সদাগরের ছেলে কাঁদছে। সেসময় আকাশমার্গে মহাদেব ও পার্ব্বতী রথে করে যাচ্ছিলেন। গভীর অরণ্যে ছেলেটির কান্না শুনে পার্ব্বতী মহাদেবকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহাদেব প্রথমে পার্ব্বতীকে 'নারী চক্ষু সর্পতো যায় আরো নরকোতো যায়' এই বলে মৃদু ভর্ৎসনা করে সদাগরের ছেলের কান্নার কারণ পার্ব্বতীকে বললেন। ঘটনা শুনে পার্ব্বতীর মন বেদনাপ্লুত হোল। তখন পার্ব্বতী মহাদেবকে অনুরোধ করলেন যাতে ছেলেটির কান্নার কারণ দূরীভূত হতে পারে। তখন মহাদেব ও পার্ব্বতী দুজন বুড়া-বুড়ীর রূপ ধারণ করে ছেলেটির সামনে গিয়ে পূজা দিলে তার মৃত ধনেশ পাখীটি প্রাণ ফিরে পাবে এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। পরে

সদাগরের ছেলেটি বুড়া-বুড়ীর পূজো করায় তার মৃত ধনেশপাখীটির প্রাণ ফিরে পেল। তখন থেকেই নাকি পৃথিবীতে এই বুড়া-বুড়ীর পূজোর ও তার ব্রতের প্রচলন হয়েছে।

এই ব্রতপূজোতে দুটি বিন্নাগাছের খোপ পাশাপাশি কাদামাটিতে পুঁতে রেখে বুড়া-বুড়ী কল্পনা করা হয়। অন্য কোন মূর্তি নেই। চিড়ে, গুড়, দৈ, কলা, গুয়া পান, ফুল এই পূজোর উপকরণ। পূজোর শেষে বিন্নার খোপরূপী বুড়া-বুড়ীকে প্রণাম জানিয়ে পূজো শেষ হলে প্রাগুক্ত ব্রতকথাটি উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে শোনানো হয়।

প্রমাণপঞ্জী

তৃতীয় খণ্ড। ব্রতকথা

১। বাংলার লোকসাহিত্য ৪র্থ খণ্ড নিবেদন।

২। মুবচনীর গানের অংশটি কোচবিহার সহরের খাগড়াবাড়ী গ্রামের নারায়ণ-রায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

৩। এই মতামত গৌরীপুর এর শিক্ষিকা গীতা মিত্রের জ্যেঠিশর বৃদ্ধা দিদিমা দিয়েছেন।

৪। এই ব্রতকথা সম্পর্কে তথ্যাদি দিয়েছেন গৌরীপুরের ধীরেন দাস মহাশয়।